গোলাম মুরশিদের রচনায় মানবীবিদ্যা চর্চা

নূর-ই-নুসরাত*

[**সারসংক্ষেপ :** আধুনিক সময়ে মানবীবিদ্যা চর্চা বহুল আলোচিত একটি বিষয়। নারী ও নারী সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ আলোচনা এবং সমালোচনা হলেও তথ্যবহুল ও বস্তুনিষ্ঠ গবেষণা খুব বেশি নেই। এই ধারায় গোলাম মুরশিদের মানবীবিদ্যা সংক্রান্ত প্রবন্ধগুলো গুরুত্বপূর্ণ। ১৮-২০ শতকে নারীদের পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয়, শিক্ষা এবং সাংস্কৃতিক অবস্থান ছিল শোচনীয়। নানা প্রতিবন্ধকতা পেরিয়ে নারীরা বর্তমান অবস্থানে উঠে এসেছে। গোলাম মুরশিদের প্রবন্ধে নারী মুক্তি তথা স্বাধীনতার পথে মূল অন্তরায়গুলো বিশ্লেষিত হয়েছে যা নারীদের আত্মসচেতনতা বৃদ্ধির সহায়ক। বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারীর প্রতি পুরুষের মনোভাব এবং নারীর নিজের প্রতি নিজের মনোভাবও তাঁর প্রবন্ধে ফুটে উঠেছে। তিনি আধুনিক নারীবাদীদের মতো পুরুষবিদ্বেষী মনোভাবকে নারী মুক্তির সঠিক পথ হিসেবে বিবেচনা করেননি বরং নারীকে নিজস্ব শক্তিতে আলোকিত হওয়ার প্রেরণা দিয়েছেন। গোলাম মুরশিদের প্রবন্ধের আলোকে নারীদের পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয়, শিক্ষা এবং সাংস্কৃতিক অবস্থান বিশ্লেষণের মাধ্যমে তাঁর মানবীবিদ্যা চর্চার স্বরূপ উন্মোচন এই প্রবন্ধের মূল আলোচ্য।]

সংকেত শব্দ : মানবীবিদ্যা, উপনিবেশবাদ, রেনেসাঁস, অবরোধপ্রথা, নারী জাগরণ।

১. ভূমিকা

গোলাম মুরশিদ (জ. ১৯৪০) মূলত গবেষক। বাংলা ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, ইতিহাস ইত্যাদি তাঁর গবেষণার ক্ষেত্র। এসব বিষয়ে তিনি অসংখ্য প্রবন্ধ লিখেছেন। সেসব প্রবন্ধে নতুন প্রসঙ্গের অবতারণা করেছেন এবং নতুন ধারণা সৃষ্টি করেছেন। এর মধ্যে বেশ কিছু প্রবন্ধ রয়েছে যেখানে মানবীবিদ্যা চর্চা প্রধান। এসব প্রবন্ধে মানবীবিদ্যা চর্চার প্রকৃত ধারা পরিলক্ষিত হয়। তিনি নারী প্রগতির ইতিহাস ও ক্রমবিবর্তনকে বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে উপস্থাপন করেছেন। বিশেষত উনিশ শতকের গোড়া থেকে নারীরা যে আত্মসচেতন হয়ে উঠছিলেন, তার প্রতিফলন প্রবন্ধগুলোতে লক্ষণীয়ভাবে ফুটে ওঠে। ফলে তাঁর মানবীবিদ্যা চর্চা বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। *আধুনিকতার অভিঘাতে বঙ্গরমণী* (১৯৮৪), *রাসসুন্দরী থেকে রোকেয়া : নারী প্রগতির একশো বছর* (১৯৯৩), *নারী ধর্ম ইত্যাদি* (২০০৭) তাঁর মানবীবিদ্যা বিষয়ক গ্রন্থ, যা এই আলোচনার মূল উপকরণ।

উনিশ শতক বাঙালির জাগরণের যুগ। এই জাগরণের অন্যতম সূচক নারী জাগরণ। নারীর প্রতি সামাজিক অত্যাচার, বিধি নিষেধ, প্রথা, পশ্চাৎপদতা এবং তা থেকে মুক্তির বিষয় নিয়ে এই শতকে সমাজে ব্যাপক আলোচনা ও আন্দোলন শুরু হয়। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে সমাজের

*প্রভাষক, বাংলা বিভাগ, রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ ও পিএইচ.ডি গবেষক, ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

শিক্ষিত ও অগ্রসর ব্যক্তিরা নারীর অবহেলিত ও নির্মম পরিস্থিতি সম্পর্কে যেমন সচেতন হন, তেমনি দুঃখিত ও লজ্জিত হন। ধর্ম ও সামাজিক অনুশাসনের নামে পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা নারীর ওপর যে মানবেতর জীবন চাপিয়ে দিয়েছিলো তার বিরুদ্ধে পশ্চিমের আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিরা প্রতিবাদ জানান। এর ফলে সমাজে সতীদাহ প্রথার বিলোপ, বিধবা বিবাহ প্রচলন, বাল্য বিবাহ ও বহু বিবাহ রোধের পক্ষে জনমত প্রবল হয়ে ওঠে ও নারী মুক্তির লক্ষ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি আইন প্রণীত হয়। সমাজ আগ্রহী হয়ে ওঠে নারীশিক্ষা বিস্তৃত করতে। আধুনিক শিক্ষিত নারীকে অন্তঃপুরের অবরোধ থেকে সমাজের মুক্ত আলোয় আনার পথ তৈরি হয়। শিক্ষায়, সাহিত্যচর্চায়, সমাজসেবায়, রাজনীতিতে, পত্রিকা-সম্পাদনায়, নারী-মুক্তি আন্দোলনে নারীর অংশগ্রহণ ক্রমে বাড়তে থাকে। শতাব্দীর প্রথমার্ধে নারী-মুক্তি আন্দোলনে পুরুষদের ভূমিকাই ছিল মুখ্য। শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে নারীদের অংশগ্রহণ শুরু হয়।

আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে নারীর মধ্যে ধীরে ধীরে অধিকার চেতনা, নতুন জীবনতৃষ্ণা ও নিজের পোশাক সম্পর্কে সচেতনতা জাগে। নারীকে মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার এই বিপুল কর্মযজ্ঞের ফলে উনিশ শতকের শেষে নারীর প্রতি পুরো সমাজের দৃষ্টিভঙ্গিতে, এমনকি নারীর নিজের মনোভঙ্গিতেও ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে। উনিশ শতকের বাংলায় যে নবজাগরণ সূচিত হয়, নারী মুক্তি আন্দোলন তারই অনিবার্য অংশ হয়ে ওঠে। সামগ্রিকভাবে উনিশশতক হয়ে ওঠে বাঙালি নারীর আত্মজাগরণ, তার বন্ধনমুক্তি ও আত্মপ্রতিষ্ঠার এক উল্লেখযোগ্য কাল। গোলাম মুরশিদ তাঁর রচনায় নারী জাগরণের এই উল্লেখযোগ্য কালপর্বকে ধারণ করেছেন। বঙ্গীয় জাগরণের ইতিহাস আরো ভালোভাবে বোঝার জন্য পরিবর্তনশীল বাঙালি সমাজে নারীদের ভূমিকা কি ছিল তা তিনি বিচার বিশ্লেষণ করেছেন।

২. মানবীবিদ্যা

নারী বিষয়ক আলোচনাই নারীবিদ্যা বা মানবীবিদ্যা। সামাজিক ইতিহাস চর্চার অন্যতম একটি ধারা মানবীবিদ্যা বা নারীর ইতিহাস চর্চা। আধুনিক ইতিহাস চর্চায় এটি বর্তমানে সবচেয়ে আকর্ষণীয় ও বিতর্কিত শাখা। সমাজ ও সভ্যতার বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারীদের ভূমিকা, অংশগ্রহণ, অবদানের দিকগুলো পর্যালোচনা করে ইতিহাসে নারীদের অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং প্রকৃত মূল্যায়নের লক্ষ্যে যে ইতিহাস চর্চা করা হয়, সাধারণত তাকেই মানবীবিদ্যা চর্চা বলা হয়। আমাদের পুরুষতান্ত্রিক সমাজের ইতিহাসে নারীদের ইতিহাস ছিল উপেক্ষিত। নারী ইতিহাস চর্চার প্রথম সূত্রপাত ঘটে ইউরোপে এবং পরবর্তীতে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। সাধারণত নারী সংক্রান্ত সামগ্রিক বিদ্যাচর্চাকেই মানবীবিদ্যা বলা হয়। নারীদের শিক্ষা, প্রগতি, স্বাধীনতা, স্বাতন্ত্র্য, সমাজ ও সভ্যতায় নারীদের অবস্থান ইত্যাদি বিষয় নিয়ে চর্চাই মানববিদ্যার অন্তর্গত। সভ্যতায় নারীদের ঐতিহাসিক অবদান, নারীর সম্পর্কে আর্থ-সামাজিক ও নৈতিকবোধ তৈরি, নারীদের অবমূল্যায়নকারী বিষয়ে সমালোচনা, ইতিহাস চর্চায় দীর্ঘ পুরুষতান্ত্রিক ধারা সংশোধন ও লিঙ্গ বৈষম্যের অবসান ঘটানো, নারীকেন্দ্রিক বিষয়গুলোকে ইতিহাস চর্চার আওতায় আনা, পুরুষতন্ত্র কীভাবে নারীর বিকাশের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায় তা বিশ্লেষণ করা, বৈষম্যমূলক দৃষ্টিভঙ্গির অবসান ঘটিয়ে নারীর মর্যাদা, অধিকার ও গুরুত্বকে প্রতিষ্ঠিত করা এবং নতুন উপাদানের মাধ্যমে ইতিহাসের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারীদের অংশগ্রহণ ও গুরুত্বের যথাযথ মূল্যায়নই মানবীবিদ্যার মূল লক্ষ্য ও বৈশিষ্ট্য। মূলত উপেক্ষিত নারী সমাজের বিভিন্ন অবদানের দিক তুলে এনে তাদের প্রকৃত মর্যাদা ও অধিকার প্রতিষ্ঠা করাই নারীবিদ্যা চর্চার মূল উদ্দেশ্য।

মানবীবিদ্যা চর্চায় প্রথম উল্লেখযোগ্য কাজ করেন সপ্তদশ শতকের ব্রিটিশ নারীবাদী Mary Wollstonecraft. তাঁর *নারীর অধিকার*, *নারীর ভাগ্য জয়ের অধিকার* ইত্যাদি গ্রন্থে তিনি

দেখিয়েছেন নারীচরিত্রের ব্যাপারে সমাজে বিরাজমান ধারণা নৈতিকতার পরিপন্থী। তিনি এই যুক্তি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছেন যে, মানুষের শরীর এবং মনের পূর্ণাঙ্গতা লাভের জন্য অবশ্যই সর্বজনীনতা বিরাজ করতে হবে। আর তা পুরুষের পৃথিবীতে কখনোই শ্রদ্ধার আসন পাবে না, যদি নারীর মানবিক বৈশিষ্ট্যগুলো সমাজে প্রতিষ্ঠিত না করা যায়। তিনি মনে করেন, যদি নারীদের বৈধ অধিকারগুলো উপভোগ করার সুযোগ না দেয়া যায় তাহলে তারা পুরুষ এবং নিজেদের– উভয়কেই নিষিদ্ধ সুযোগ হাসিলের পঙ্কিলতায় ডুবিয়ে দেবে। মেরি ওলস্টোনক্রাফট সপ্তদশ শতকের সেসব শিক্ষাবিদ ও রাজনৈতিক তাত্ত্বিকদের বিরুদ্ধে লিখেছেন যারা নারীশিক্ষাকে অস্বীকার করতে চেয়েছিল। তিনি যুক্তি দেখিয়েছেন যে, সমাজে নারীর অবস্থানের গুরুত্বের সমতুল্য শিক্ষা পাওয়া দরকার। কারণ নারী সমাজের অপরিহার্য অংশ। তিনি মূলত মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত নারীদের মানবিক বৈশিষ্ট্য এবং অবমানিত অবস্থার কথা তুলে ধরেছেন। তিনি লিখেছেন, জন্ম থেকেই মেয়েদেরকে সমাজ মেয়ে হিসেবে গড়ে তোলে এবং প্রধানত তারা পুরুষকে খুশি করার মনোভাব নিয়ে বেড়ে ওঠে। ফলে মানুষ হওয়ার মৌলিক সদ্‌গুণ বা নৈতিক উৎকর্ষ সাধনে তারা সচেষ্ট হয় না, যা তাদের বিকলাঙ্গ মানুষে পরিণত করে। তিনি নারীদের এই অবস্থা থেকে মুক্তির পথ অনুসন্ধান করেছেন।

ফরাসি ঔপন্যাসিক, দার্শনিক ও প্রাবন্ধিক সিমোন দ্যা বোভোয়ারের *দি সেকেন্ড সেক্স* গ্রন্থটি মানবীবিদ্যা চর্চায় আরেকটি মাইলফলক। তিনি তাঁর গ্রন্থে প্রমাণ করেছেন কেউ নারী হয়ে জন্মায় না, বরং নারী হয়ে ওঠে। বিশ শতকের দ্বিতীয়াংশের নারীবাদ এবং পুরুষতান্ত্রিকতাকে তিনি বদলে দিয়েছেন। সভ্যতায় নারীর পরিস্থিতিকে তিনি ব্যাখ্যা করেছেন অস্তিত্ববাদী নীতিশাস্ত্রের প্রেক্ষাপটে। 'তাঁর মূল প্রতিপাদ্য হচ্ছে আমরা মানুষ, কেননা আমরা পেরিয়ে যাই প্রকৃতিকে, মানুষ হওয়ার অর্থ ক্রমশ হয়ে ওঠা, বিকশিত হওয়া, সৃষ্টি করা; জীবনের মূল্য শুধু বেঁচে থাকায় নয়, বরং জীবনকে নিরন্তর বিকশিত করার মধ্যে' (হুমায়ুন, ২০১২ : ১৩)। কিন্তু পুরুষতন্ত্র সমাজে তৈরি করেছে নারীদের প্রতি বিরূপ ধারণা। ১৭৯২ সালে মেরি ওলস্টোনক্রাফটের 'ভিন্ডিকেশনে'র পরে অনেকেই নারীবাদ নিয়ে কাজ করেছেন। তাদের মধ্যে অন্যতম রামমোহন রায়, লুসি স্টোন, কেডি স্ট্যান্টন, সুজ্যান অ্যান্থনি, ফ্যানি রাইটি, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, স্টুয়ার্ট মিল, হেনরিক ইবসেন, বেগম রোকেয়া, রোসা লুক্সেমবার্গ, ভার্জিনিয়া উল্ফসহ অনেকে।

আঠারো শতকের শেষাংশে ও উনিশ শতকের গোড়ার দিকে যখন পাশ্চাত্যের নারীমুক্তির আন্দোলনে সোচ্চার তখনও ভারত উপমহাদেশে নারীর আক্ষরিক অর্থে বেঁচে থাকার ন্যূনতম অধিকারের দাবি সবেমাত্র উচ্চারিত হতে শুরু করে। বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, বিধবা বিবাহ, সতীদাহ, স্ত্রীশিক্ষা ও স্বাধীনতার অভাব এবং অবরোধ প্রথা সব মিলিয়ে নারীর সামাজিক অবস্থা ছিল অত্যন্ত সংকটাপন্ন। কিছু ইংরেজের সক্রিয় সহযোগিতায় বিশেষ করে মিশনারিদের উদ্যোগে ভারতে স্ত্রী শিক্ষার উন্মেষ ঘটে উনিশ শতকের গোড়ার দিকে। তবে লজ্জা ও ভয়ের সংস্কৃতি নারী অগ্রসরের পথে প্রথমে বাধা সৃষ্টি করে:

> সম্পর্কের এই অসমতা যা উৎপাদিত ও পুনরুৎপাদিত হয় বস্তুগত সম্পদের ওপর অধিকারের অসমতা থেকে, ভাবাদর্শগত কারণে এবং ভাবাদর্শিক প্রতিষ্ঠানের সাহায্যে বহাল রাখতে প্রয়োজন হয় বল প্রয়োগের, সন্ত্রাস ও আতঙ্ক সৃষ্টির। [...] লিঙ্গজ অসম সম্পর্কের ক্ষেত্রেও প্রবল লিঙ্গ অধঃস্তনের ওপর তার কর্তৃত্ব জারি রাখে এই প্রক্রিয়ায়। (রীয়াজ, ১৯৯৫ : ৮৪)।

রুশ বিপ্লবের পূর্বে যে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক বিশ্বের অস্তিত্ব ছিল তার বড় পরিবর্তন ঘটে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও রুশ বিপ্লবের পর। পুঁজিতান্ত্রিক বিশ্বে তখন পৃথিবী দুই ভাগে

বিভক্ত হয়ে যায়। একদিকে ঔপনিবেশিক পুঁজিবাদী শক্তি অপরদিকে উপনিবেশিত রাষ্ট্র। উপনিবেশগুলোতে শিল্পায়নের গতি ছিল খুবই শ্লথ। পুরনো সমাজ ও উৎপাদন ব্যবস্থার মধ্যে, ঔপনিবেশিক অত্যাচার ও নির্যাতনের প্রক্রিয়াতেই কিছু নগরায়ণে, শাসকদের ভাষা-শিক্ষা, যোগাযোগ স্থাপন হয়। ইউরোপে দর্শন-বিজ্ঞান রাজনৈতিক চেতনার ক্ষেত্রে যে পরিবর্তন এসেছিল তার প্রভাব ভারতবর্ষেও প্রতিফলিত হয়। ইউরোপের উনিশ শতকের অগ্রসর চিন্তাবিদদের ধ্যান-ধারণা ও লেখালেখিতে তা স্পষ্ট। উনিশ শতকের শেষের দিকে অনেক সামাজিক ও পারিবারিক বাধা, আপত্তি এবং কুৎসার মধ্যেও কিছু কিছু নারী উচ্চশিক্ষা গ্রহণ ও বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত হন। "সম্পত্তির ব্যক্তিগত মালিকানার উদ্ভব ও কর্তৃত্বের সামষ্টিক রূপ থেকে ব্যক্তির রূপ লাভ প্রক্রিয়ায় নারীর ওপর পুরুষের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হবার ধারণাটি এখন পর্যন্ত সবচেয়ে যুক্তিযুক্ত কাঠামো উপস্থিত করে।"(আনু, ২০১২ : ৩২)

উনিশ শতকে সামাজিক, ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক জীবনের ক্ষয়িষ্ণুতার বিরুদ্ধে রেনেসাঁস বা নবজাগরণের প্রয়োজন অত্যাবশ্যকীয় ছিল। "আধুনিক শিক্ষা-দীক্ষায় এবং ইউরোপীয় সভ্যতার অভিঘাতে উনিশ শতকের ভারতবর্ষের বাঙলায় মনুষ্যত্বের একটা সর্বাঙ্গীন আদর্শ লক্ষ করা যায়, যাকে অতি সহজেই নতুন হিসেবে আলাদা করা চলে" (সাইফুল, ২০০৯ : ২)। ভারতবর্ষের তথা বাংলার সংস্কৃতিতে এ সময়টা ছিলো নবজাগরণের। রেনেসাঁসের এই মানবকল্যাণমুখী জাগরণের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে নারী জাগরণ। নারীদের আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থা এতটাই অসহায়, দুর্বল, অধিকারহীন ও অক্ষম করে রাখা হয়েছিল যে, নিপীড়িত হয়েও নিজেদের মুক্তির কথা তারা ভাবতেও পারেনি। কিন্তু সমাজের সার্বিক প্রগতির জন্য যাঁরা চিন্তা-চেতনা, সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন ইতিহাস ইত্যাদির নতুন দিক নিয়ে চর্চা শুরু করেন তাঁরা রেনেসাঁসের মানবিক আবেদন থেকে নারীসমাজের সামজিক নিপীড়ন বন্ধের জন্য এগিয়ে আসেন ও প্রতিবাদ জানান। এই আন্দোলন সমাজ সংস্কারমূলক হলেও নবজাগরণের ইতিহাস গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে:

> ভারতবর্ষে নারীশিক্ষা প্রসারে খ্রিস্টান ও ব্রাহ্ম সমাজের ভূমিকা অগ্রগণ্য। হিন্দু ও ব্রাহ্ম সমাজের মধ্যে যেটুকু জাগরণ এসেছিল তার ফলে সেই সমাজের মেয়েদের সামাজিক নিপীড়ন বন্ধের জন্য একটা উদ্যোগ ও চেষ্টা দেখা গিয়েছিল। কিন্তু ভারতীয় সমাজের দুই মেরুতে বাস করছিলো হিন্দু ও মুসলিম জনগণ। (মালেকা, ২০০২ : ৩৭)

নারী জাগরণের আন্দোলনের সূচনা হয় অবিভক্ত ভারতবর্ষের উদারনৈতিক তত্ত্বের ভিত্তিতে। এ জাগরণের মূলে ছিল ইউরোপের শিল্প বিপ্লবের প্রভাব। নারী জাগরণের পথ উন্মুক্ত হওয়ায় বিভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত নারীদের অধিকার, উন্নয়ন, প্রগতি ও দাবি উত্থাপনের প্রশ্নে সামাজিক আন্দোলন দানা বাঁধে মূলত দুটি ধারায়– "সংস্কারমূলক ও উপনিবেশবিরোধী জাতীয় রাজনৈতিক মুক্তি আন্দোলনের ধারা। নারীমুক্তির আন্দোলনের পূর্বশর্ত হচ্ছে নারীর জাগরণ।" (নিবেদিতা, ১৯৯৯ : ১৪)

১৮-২০ শতক ছিল ভারতবর্ষের রেঁনেসাসের যুগ। পুরোটা সময় জুড়ে সামাজিক ও রাজনৈতিক সংস্কার সাধিত হয়। এই সময়েই নারীরা তাদের অবরোধ প্রথা ও পরাধীনতা নিয়ে সচেতন হয়ে ওঠেন। ফলে মানবীবিদ্যা চর্চার ইতিহাস এই কালপর্বে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। গোলাম মুরশিদের গবেষণার একটা বড়ো পরিসর জুড়ে রয়েছে উনিশ ও বিশ শতকে বাঙালি জীবনের বিবর্তন। বৃহৎ, ব্যাপ্ত ও বহুমুখী এই ক্ষেত্রটির উপর তিনি আলো ফেলেছেন বিভিন্ন দিক থেকে। "সমাজ, সংস্কৃতি নৃতত্ত্ব, ধর্ম, শিক্ষা, সাহিত্য, রাজনীতি প্রভৃতি সমান্তরাল ও পরস্পর

সম্পৃক্ত অজস্র পথে বিকীর্ণ যে বাঙালি মানস, তার স্বরূপ উদ্‌ঘাটনে প্রয়াসী তিনি।" (সুমনা, ২০১৯ : ৫৮) বৃহৎ পরিসরের আলোচনায় একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হয়ে উঠেছে মানবীবিদ্যা চর্চা। যেখানে তিনি নারীর অবরোধ প্রথা, নারীর পারিবারিক অবস্থান, নারীর সামাজিক অবস্থান, নারীদের ধর্মীয় অবস্থা, নারীদের অর্থনৈতিক অবস্থা, নারীদের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড, শিক্ষায় নারীর অবস্থান ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করেছেন।

৩. গোলাম মুরশিদের রচনায় মানবীবিদ্যার স্বরূপ

গোলাম মুরশিদের মানবীবিদ্যা বিষয়ক প্রবন্ধে নারীর বিভিন্ন বিষয় উঠে এসেছে। নারী জাগরণের সূচনা থেকে পর্যায়ক্রমে তাদের অগ্রযাত্রার প্রতিটি পদক্ষেপ এবং প্রতিবন্ধকতা তাঁর গবেষণায় উঠে এসেছে। বিলকিস রহমান বলেন–

> গোলাম মুরশিদ তাঁর গ্রন্থে উনিশ শতকের ইংরেজি-শিক্ষিত বাঙালি ভদ্রলোকদের একাংশ কিভাবে আধুনিকায়ন-প্রক্রিয়ার সঙ্গে মহিলাদের যুক্ত করেন এবং মহিলারা কিভাবে তার প্রতি সাড়া দেন তা বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি বঙ্গদেশে স্ত্রীশিক্ষার সূচনা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন এবং শিক্ষার প্রতি ভদ্রমহিলাদের মনোভাব ব্যাখ্যা করেছেন। সমাজে মহিলাদের সম্পর্কে ধারণা কীভাবে পরিবর্তিত হয়েছে তাও তিনি দেখিয়েছেন। (বিলকিস, ২০১৩ : ২)

গোলাম মুরশিদের রচনা থেকে আমরা বুঝতে পারি নারী জাগরণের এই পথ সরলরৈখিক ছিল না। সে সময়ে অর্থ-সামাজিকসহ সকল অধস্তন অবস্থা থেকে মুক্তিলাভের জন্য নারীরা পুরুষের দিকেই তাকিয়ে ছিলেন কিন্তু পুরুষরাও সেক্ষেত্রে দ্বিধামুক্ত হয়ে এগিয়ে আসেননি এমনকি নারীরাও ছিল দ্বিধান্বিত। যখন 'নারীবাদ' ধারণাটি প্রচলিত ছিল না তখন থেকেই তিনি নারীমুক্তি বিষয়ে প্রবন্ধ রচনা করেছেন। তিনি বলেন, "পঁচিশ বছর আগেও নারীবাদ শব্দটা বাংলা ভাষায় ছিল না। [...] তখনো নারীদের উন্নতি বোঝানোর জন্য যে পরিভাষা চালু ছিল, তা হলো নারী স্বাধীনতা অথবা নারীমুক্তি।" (মুরশিদ, ২০০৭ : ৬৪)

আধুনিক নারীবাদী তসলিমা নাসরিনের ভালোমন্দ দিক বিশ্লেষণ করে তিনি দেখিয়েছেন নারীরা বর্তমানে নিজেদের নয় পুরুষকে নিয়ে চর্চা করতে অধিক পছন্দ করেন। তিনি তাঁর "নারীবাদের সহি সবক" প্রবন্ধে আধুনিক নারীবাদী তত্ত্বের সামালোচনা করেছেন। দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা এই পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীরা পারিবারিক ও ধর্মীয় বেড়াজালে কতোটা অবরোধবাসিনী ছিল তারই স্বরূপ তুলে ধরেছেন গোলাম মুরশিদ। কেবল তা-ই নয়, বরং নারীদের অবরোধ প্রথা ভেঙে শিক্ষা ও সামাজিক সংস্কারে অগ্রসর হওয়ার নেপথ্যের কারণ বিশ্লেষণপূর্বক পুরুষতন্ত্রের হীনস্বার্থ চরিতার্থ করার চিত্র তুলে ধরেছেন। অন্যদিকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারীর অবস্থান এবং নারীর প্রতি পুরুষের মনোভাব তাঁর প্রবন্ধে অনুধাবন করা যায়। আধুনিক যুগে নারীরা তাদের অবরোধ, অনধিকার ও অধীনতা সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠলে নারীবিদ্যা চর্চার সূচনা হয়। তবে একটি ভয়ানক বিষয় হলো, নারীদের এই সচেতনতা পুরুষদের মাধ্যমে, পুরুষদের প্রয়োজনে সাধিত হয়েছিল। সুতরাং এই সচেনতা নিয়ে সন্দেহ থেকেই যায়। গোলাম মুরশিদ বলেন–

> বাঙালি নারীদের 'মুক্তির' আন্দোলন শুরু করেন পুরুষরা। সুতরাং সত্যিকার অর্থে পুরুষদের শাসন থেকে নারীদের পুরোপুরি স্বাধীন করার আন্দোলন ছিলো না। বরং বলা যায়, পুরুষরা অংশ তাদের নিজেদের জীবন ও জগৎকে আধুনিক করে তোলার জন্য এবং অংশত নারীদের প্রতি সহানুভূতিবশত এ আন্দোলন শুরু করেন। (মুরশিদ, ২০১৯ ক : ১৮০)।

উনিশ শতকে নারীর জাগরণের সংগ্রামী ইতিহাস, নারীর অবরোধ প্রথা, নারীর পারিবারিক অবস্থান, নারীর সামাজিক অবস্থান, নারীদের ধর্মীয় অবস্থা, নারীদের অর্থনৈতিক অবস্থা, নারীদের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড, শিক্ষায় নারীর অবস্থান ইত্যাদি গোলাম মুরশিদের রচনায় আলোচিত হয়েছে। সুতরাং এই বিষয়গুলোকে তিনি কীভাবে উপস্থাপন করেছেন তা বিশ্লেষণের মাধ্যমে তাঁর মানবীবিদ্যা চর্চার স্বরূপ বিশ্লেষণ করা সম্ভব হবে।

৩.১. নারীর অবরোধ প্রথা

পর্দার নামে নারীকে অন্তঃপুরে রাখার প্রথা বহুদিন ধরেই সমাজে বিদ্যমান ছিল। মূলত নারীকে বৃহত্তর সামাজিক ক্ষেত্র থেকে বিচ্ছিন্ন করার একটি মধ্যযুগীয় ব্যবস্থা হিসেবে অবরোধ প্রথা চালু করা হয়। আঠারো শতকে বাংলার নারীরা অবরোধ প্রথার অধীনে ছিল এবং এই প্রথা হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে প্রচলিত ছিল। "মুসলিম বাড়িতে কখনো আগুন লাগলে হারেমের বিবিরা বেপর্দা হবেন ভেবে পুরুষরা পানির বালতি নিয়ে এগোতে ভয় পেতেন" (জয়িতা, ২০১৭: ৭৪)। বেগম রোকেয়ার *অবরোধ-বাসিনী*তে এমন ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায়। শুধু মুসলমান ঘরেই নয়, হিন্দু পরিবারেও কঠোরভাবে পর্দা পালন করতে হতো নারীদের। হিন্দু সমাজের মেয়েদের অবরোধ পালন করতে হতো সাত/আট বছরের সময়ে বিয়ে হয়ে যাবার পর থেকেই। আর মুসলমানদের মধ্যে মেয়েদের বন্দিত্ব আরম্ভ হতো আরও আগে থেকে। "মেয়েদের তখন কেবল পুরুষদের সঙ্গেই নয়, পর্দা পালন করতে হতো শাশুড়ি এবং এ জাতীয় অন্য মহিলাদের সঙ্গে" (মালেকা ও আজিজুল, ২০০৪ : ২)। মূলত নারীদের শিক্ষা, উন্নতি, স্বাধীনতা এবং আধুনিকাতার মূল শর্ত ছিল অবরোধমোচন। তৎকালীন সমাজে এই অবরোধমোচনকেই স্বাধীনতা বলে বিবেচনা করা হয়। গোলাম মুরশিদ এই অন্তঃপুরবাসিনীদের দুর্বিষহ জীবনকে তুলে ধরেছেন। তখনকার নারীরা অন্তঃপুরের অবরুদ্ধ, অশিক্ষিত এবং পুরোপুরি পুরুষের মুখাপেক্ষী ছিলেন। নিম্নশ্রেণির নারীরা এক্ষেত্রে কিছুটা স্বাধীন ছিলেন। কিন্তু ভদ্রঘরের নারীদের ছিল কঠোর অবরোধ প্রথা। নারীরা স্বামীর আদেশ দ্বারা পুরোপুরি নিয়ন্ত্রিত হতো। তাদের নিজের কোনে সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার ছিল না। নারীকে জনসম্মুখে নিয়ে আসার বিষয়টি ছিল চরম অসম্মানজনক ও প্রথাবিরোধী। দিনের আলোতে স্বামীর মুখ দেখাও নিষিদ্ধ ছিল। মুসলমান নারীদের জন্য এই প্রথা ছিল আরও কঠোর, যা বেগম রোকেয়ার জীবনের বিভিন্ন ঘটনা থেকে অনুমেয়। তৎকালে হিন্দু-মুসলিম পাথর্ক্য যা-ই থাক নারীকে আমৃত্যু পবিত্রতা ও সতীত্ব রক্ষার নামে পর্দা প্রথার শৃঙ্খলে কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হতো। নিম্নশ্রেণির নারীদের অবস্থা তুলনামূলকভাবে উন্নত ছিল– অন্তত উচ্চশ্রেণির নারীদের মতো তারা অন্তঃপুরে বন্দি ছিলেন না। এমন কি সতীদাহ, কুলীন, বহুবিবাহ, একান্নবর্তিতা, পর্দাপ্রথা ইত্যাদি সামাজিক প্রতিষ্ঠানেও তারা শিকার ছিলেন না। ১৮৬০ এর দশকে শিক্ষিত সমাজের ক্ষুদ্র এক অংশে সাধারণভাবে মেয়েদের স্বাধীনতা এবং বিশেষভাবে অবরোধমোচন সম্পর্কিত মনোভাব কিছুটা পরিবর্তন হয়। তবে তা ছিল প্রধানত খ্রিষ্টান ও ব্রাহ্ম সমাজের গুটিকয়েক প্রগতিশীল ব্যক্তির কারণে। ১৮৫০ এর দশকের শেষ পর্যন্ত সমাজ সংস্কারের ঝোঁক ছিল স্ত্রীশিক্ষার ওপর। কিন্তু ১৮৬০ এর দশকে তাঁরা উপলব্ধি করতে সমর্থ হন যে, স্ত্রীশিক্ষা তথা নারীদের মানসিক বৃত্তির বিকাশে সবচেয়ে বড় বাধা হলো অবরোধ প্রথা। কিন্তু স্ত্রীশিক্ষার বিষয়ে অনেকে অনুকূল সাড়া দিলেও পর্দা প্রসঙ্গে ততোটা আধুনিক মনের পরিচয় দিতে পারেননি। রাসসুন্দরী দেবী, কৈলাসবাসিনী দেবী, জ্ঞানদানন্দিনী দেবী থেকে বেগম রোকেয়া পর্যন্ত সকলেই এই অবরোধ প্রথার অভিশাপের কথা তাঁদের জীবনীতে লিখেছেন এবং এই অবরোধ প্রথা ভেঙে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করেছেন। গোলাম মুরশিদ তাঁর প্রবন্ধে দেখিয়েছেন

অবরোধ মোচনই ছিল নারী স্বাধীনতার প্রথম পদক্ষেপ। পরবর্তীতে যা নারীদের অধিকতর স্বাধীন ও স্বাবলম্বী হওয়ার জন্য সাহসী করে তোলে।

৩.২. নারীর পারিবারিক অবস্থা

পারিবারই সমাজের মৌলিক একক। এই পরিবারিক আবহে নারী ছিল অবরুদ্ধ, খাঁচায় বন্দি পাখির মতো। তারা ছিলো নিগৃহীত, অবহেলিত ও উপেক্ষিত। বাল্যবিবাহ, সতীদাহ, বহুবিবাহ নারীকে পরিবারে অধঃস্তন করে রাখে। প্রত্যাহিক জীবনে মহিলাদের ক্রীতদাসীর মতো দৈহিক শ্রম করতে হয়। নাবালিকা অবস্থায় নিজের অজান্তেই তখন নারীদের বিবাহ হতো। বিয়ে ও পরিবারের বিষয় কোনো সিদ্ধান্ত বা মতামত দেওয়ার ন্যূনতম অধিকার তাদের ছিল না। বিয়ের পরে আরেকটি সমস্যা ছিল শ্বশুরবাড়ির আত্মীয়দের সঙ্গে সমস্যা। অনেক সময়েই একান্নবর্তী পরিবারে শাশুড়ি, ননদ এবং জা-দের সঙ্গে সম্পর্ক সুখের হতো না। তবে কিছু কিছু পরিবারের নারীরা স্বামীর উৎসাহে লেখাপড়া শুরু করেন। গোলাম মুরশিদ দেখিয়েছেন–

> কৈলাসবাসিনী দেবী, জ্ঞানদানন্দিনী এমনকি বেগম রোকেয়াও স্বামীর আগ্রহ ও সহযোগিতায় শিক্ষিত হয়ে ওঠেন। স্ত্রীশিক্ষা ও স্বাধীনতার ফলে ধীরে ধীরে একান্নবর্তী পরিবার ভেঙে যেতে থাকে। কুলীন কন্যাদের বিবাহ না হওয়ায় এবং অসম বিবাহের সমস্যা, ভঙ্গুর কুলীনদের বহুবিবাহ, বংশজদের জাতে ওঠার আকাঙ্ক্ষা এবং কন্যা বিক্রয়, শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণদের কন্যাপণ এবং বৈদিক ব্রাহ্মণদের বাল্যবিবাহসহ বিভিন্ন ধরনের সমস্যা তখন আলোচিত হয়। (মুরশিদ, ২০১৮ : ৫৫)

উনিশ শতকের শেষ দুই দশকে নারীরা লেখালেখির মাধ্যমে এসব বিষয়ে বারবার বিতর্কে অবতীর্ণ হন। স্বামীর সম্পত্তিতে নারীদের তখন কোনো অধিকার ছিল না। এমনকি হিন্দু বিবাহ আইন ও পারিবারিক আইন ১৯৫৬ ভারত স্বাধীন হবার পর প্রণীত হয়। তখন পুরুষ অনুগ্রহ করে যা দান করতো নারীরা তাতেই সন্তুষ্ট থাকতো। নারী ভোর থেকে রাত দুপুর পর্যন্ত সংসারের কাজ করে, ছেলেমেয়েদের লালনপালন করে, ঘরদোর রক্ষণাবেক্ষণ করে। শয্যাসঙ্গিনী হিসেবে পুরুষদের কামবাসনা চরিতার্থ করে। গোলাম মুরশিদ তাঁর *হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি* গ্রন্থের "প্রণয়, পরিণয়, পরিবার" শীর্ষক আলোচনায় তৎকালীন পারিবারিক চিত্র ও নারীদের অবস্থান আলোচনা করেছেন এবং নারীদের সকল প্রতিবন্ধকতা পেরিয়ে যাওয়ার ইতিহাস তুলে ধরেছেন। তিনি বলেন,

> একান্নবর্তী পরিবারের নিয়ম এতো কঠোর ছিলো যে, পরিবারের কোনো সদস্যা পারিবারিক বাসস্থান থেকে অনেক দূরে চাকরি অথবা অন্যকোনো কাজ করলে, সেখান থেকেই টাকা পাঠাতেন, মাঝে মাঝে বাড়িতে এসে স্ত্রী এবং সন্তানদের সঙ্গ পেতেন। কিন্তু নিজের স্ত্রী এবং সন্তানদের পৈত্রিক বাড়ি থেকে কর্মস্থানে নিয়ে যাওয়ার অনুমতি পেতেন না। (মুরশিদ, ২০১৯ খ : ২২৯)

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাসে আমরা নারীর এই চিত্র দেখতে পাই। তবে উনিশ শতকেই কেউ কেউ একান্নবর্তী পরিবারের বন্ধন কাটিয়ে স্ত্রী এবং সন্তানদের নিজের কর্মস্থলে নিয়ে যেতে আরম্ভ করেন। জ্ঞানদানন্দিনী স্বামীর সাথে প্রথম বিদেশযাত্রা করেন। তবে তাঁর এই জয় ছিল পরিবার ও সমাজের বহু বাধা পেরিয়ে। পরবর্তীতে নারীদের বিদেশ গমনের এই ধারা অব্যাহত ছিল।

৩.৩. নারীর সামাজিক অবস্থা

ভারতবর্ষের ইতিহাসে উনিশ ও বিশ শতক ছিল সমাজ সংস্কারের যুগ। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে গড়ে ওঠা নব্য শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বা 'ভদ্রলোক' শ্রেণির প্রভাবে উনিশ শতকের শুরুতে সমাজের আধুনিকায়ন ঘটে। এটি বাংলার 'রেনেসাঁস' বা 'নবজাগরণ' হিসেবে পরিচিত। প্রধানত ইয়ংবেঙ্গল, ব্রাহ্ম সমাজ ও দেশীয় খ্রিষ্টানদের ইংরেজি শিক্ষা ও জীবনযাত্রার প্রভাবে তা সম্ভব হয়। এর পূর্বে "শাস্ত্রকার মনু থেকে আরম্ভ করে সাধারণভাবে পুরুষ সমাজ নারীদের নিচু দৃষ্টিতেই দেখতে অভ্যস্ত ছিলো। এমনকি নারীদের অনেক সময়ে পুরুষের মতো ব্যক্তি হিসেবেও গণ্য করা হতো না।" (মুরশিদ, ২০১৫ : ১৩৯)। নারীদের কোনো জ্ঞানবুদ্ধি অথবা মেধা আছে বলে সাধারণ লোকেরা মনে করতো না। তাদের নির্বুদ্ধিতা বোঝাতে অবজ্ঞার সঙ্গে ব্যঙ্গ করে বলা হতো 'স্ত্রীবুদ্ধি'। নারীদের সামাজিক অবস্থান এতটাই হেয় ছিল যে তার নিজস্ব নামটাও সে ভুলে যেতো জীবদ্দশায়। অমুকের বউ, অমুকের মা হয়ে উঠতো তার পরিচয়। মূলত পুরুষশাসিত সমাজে নারীদের চিন্তাও পুরুষ প্রভাবিত ছিল। আহমদ শরীফ বলেন:

> পুরুষের চিত্তবিনোদন ও রতি-মরণ পাত্রী হওয়াই যখন নারীর একমাত্র সামাজিক উপযোগ বলে বিবেচিত হল, তখনই সভ্য সমাজে দুনিয়ার সুন্দরীতম নারীর সন্ধান এবং তাকে বাহুবলে ছিনিয়ে আনাই বীরত্ব, শ্রেষ্ঠ মনুষ্যত্ব, পার্থিব জীবনের সবচেয়ে কৃতি ও কীর্তি বলে বিবেচিত হল। (আহমদ, ২০১১ : ২৬০)

এজন্য অত্যাচার যতোই মর্মান্তিক হোক এবং সামাজিক মর্যাদা যতোই নগণ্য হোক, সেকালে বাঙালি মহিলারা তাকেই স্বাভাবিক মনে করতেন। বেগম রোকেয়ার লেখায় সমাজে পুরুষের চোখে নারীর অবস্থান স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তখনকার নারীরা আত্মবিশ্বাসী নয়, সমাজের নামে আত্মত্যাগের আদর্শেই বিশ্বাসী ছিলেন। পুরুষেরাও নারী সহিষ্ণুতার প্রশংসা করেন। এতে তাদের শোষণ ও দুর্ব্যবহারে সমর্থন করে। আত্মসম্মান বিসর্জন দিয়ে যে নারী স্বামী ও সংসারের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করতেন তিনিই ছিলেন আদর্শ নারী। সমাজ তাকে সাধুবাদ জানাতো। পাশ্চাত্য শিক্ষার সঙ্গে ঐতিহ্যিক সমাজের যে দ্বন্দ্ব ছিল এবং এই দ্বন্দ্বের ফলে বলি হতেন নারী সমাজ– গোলাম মুরশিদের প্রবন্ধে তা স্পষ্ট।

৩.৪. নারীদের ধর্মীয় অবস্থা

ভারতবর্ষে ধর্মের দোহাই দিয়ে নারীদের শোষণের ইতিহাস দীর্ঘ। ধর্মীয় বেড়াজালে আবদ্ধ রেখে তাদের দমিয়ে রাখা হতো । বিভিন্ন ধর্মীয় বিধি-বিধান ও আচার-ব্যবস্থা নারীকে চাপিয়ে দেওয়া হতো। ধর্মীয় কারণেই আট-নয়-বারো বছরের কন্যাসন্তানকে বিবাহ দিতেই হতো। নইলে সমাজে নিন্দিত ও পতিত এবং অবিভাবকদের নরকে স্থিতির আশঙ্কা থাকতো। গোলাম মুরশিদ তাঁর 'ধর্ম ও নারী' প্রবন্ধে বলেছেন,

> ধর্মে ধর্মে দুস্তর ভেদ আছে। এক ধর্মে যা পুণ্যের কাজ, অন্য ধর্মে তা রীতিমতো পাপ বলে বিবেচিত হতে পারে। [...] বিচার করে দেখলে ধর্মে ধর্মে এরকমের অমিল দেখা যাবে বিস্তর। কিন্তু সব ধর্মেই পুরুষদের তুলনায় নারীদের হেয় দেখানো হয়েছে। ধর্মের বিধান অনুযায়ী নারীরা মনুষ্যেতর জীব। (মুরশিদ, ২০০৭ : ৮৩)।

প্রত্যেক ধর্মে নানা ধরনের বিধান দিয়ে নারীকে নিচু করে রেখেছে। ইসলাম ধর্ম সম্পত্তিতে নারীর অধিকার রাখলেও অন্য ধর্মে নেই। আর অধিকার থাকলেও পালনীয় বলা যায় না। নারী এবং ক্রীতদাসের মধ্যে কার্যত কোনো বিভেদ নেই। নারীর অবরোধ প্রথার প্রধান হাতিয়ার হলো ধর্ম ও ধর্মীয় অনুশাসন। গোলাম মুরশিদ সোচ্চার কণ্ঠে উচ্চারণ করেছেন, 'কারো পদতলে বেহেস্ত নয়'। এই প্রবন্ধে তিনি বলেন, 'স্বামীর পদতলে নারীর বেহেস্ত - কোনো

ধর্মগ্রন্থে এমন কথা লেখা নেই। তা সত্ত্বেও মনু থেকে শুরু করে আধুনিক ধর্মগুরুদের ফতোয়া কাজে লাগিয়ে নারীদের হীনতা এবং অধীনতাকে জোরদার করা হয়েছে। প্রাচীনকাল থেকে এখনো পর্যন্ত ধর্মের নামে নারীদের শাসন শোষণ করার অপচেষ্টা অব্যাহত।

ধর্মের দোহাই দিয়ে অবরোধ প্রথার পাশাপাশি আরেকটি বিষয় হলো জন্মনিয়ন্ত্রণ। এ বিষয়ে মনে করা হয়, "মুখ দিয়েছেন যিনি, অন্ন দেবেন তিনি"। এই ধারণা থেকে যৌনজীবন বা জন্মনিয়ন্ত্রণে নারীরা খুব অসহায়। তাদের একবার গর্ভবতী করে দিতে পারলে দু-তিন বছরের জন্য বেশ নিশ্চিন্ত থাকা যেত। আর ধর্মের ভয় দেখিয়ে গর্ভপাত তখন নিষিদ্ধ ছিল। গোলাম মুরশিদ মনে করেন, জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি আবিষ্কার প্রগতির পথে নারীদের একধাপ এগিয়ে দিয়েছে। নারীবাদীদের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে উল্লেখ করেছেন সংসারের আয়তনকে। কারণ, একজন নারী ১২-১৪টি সন্তান লালন-পালন করতেই তার জীবন কাটিয়ে দিতেন। জন্মনিয়ন্ত্রণের ফলে নারীমুক্তির নতুন পথ উন্মোচিত হয়।

৩.৫. নারীদের অর্থনৈতিক অবস্থা

অর্থনীতিই একজন মানুষের মুক্তির পূর্বশর্ত। অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হলেও সে অনেক বাধা অতিক্রম করতে সক্ষম হয়। উনিশ শতকে বাঙালি নারীজীবনের অনেক গুণগত পরিবর্তন হয়েছে। কিন্তু তা বৃহত্তর পুরুষ সমাজকে খুব বেশি প্রভাবিত করেনি। ওই নারীদের যেসব সামাজিক সমস্যা ও তর্ক-বিতর্ক ছিল তা প্রধানত উচ্চবিত্ত নারীকেন্দ্রিক। কারণ তারা অর্থনীতিতে কোনো অবদান না রাখায় আরও বেশি গৃহবন্দী ছিল। শ্রমজীবী নারী, পরিচারিকা, ধাত্রী, বারবণিতা, নর্তকী, বাইজী, নষ্টিনী, ঝাড়ুদার, তরকারি বিক্রেতা, বোষ্টমী, পথগায়িকা প্রমুখ নারীদের স্বাধীন আয় ছিল। পরিবারের বিভিন্ন কাজে সহায়তা করতো শ্রমজীবী নিম্নবিত্ত নারীরা। গোলাম মুর্শিদ নারীদের অর্থনীতির ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তিনি তাঁর গবেষণায় দেখিয়েছেন ভদ্র পরিবারের নারীদের তুলনায় অন্ত্যজ শ্রেণির নারীদের অধিক স্বাধীনতা ছিল। তৎকালীন নারীর অধিকার সম্পর্কে যাঁরা সচেতন ছিলেন তাঁরাও কল্পনা করতে পারেননি যে, নারীর কোনো স্বাধীন পেশা থাকতে পারে। এর মধ্যে কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্য মনোমোহিনী হুইলার ১৮৮০ এর দশক থেকেই শিক্ষা বিভাগের উচ্চপদে কাজ করে আসছিলেন। বিভিন্ন পর্যায়ে শিক্ষকতার কাজেও বেশ কয়েকজন নারী যোগ দিয়েছিলেন। গোলাম মুরশিদের প্রবন্ধ থেকে জানা যায়–

> বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি লাভ করেন চন্দ্রমুখী বসু, কাদম্বিনী বসু, কামিনী সেন, ভার্জিনিয়া মেরী মিত্র, বিধুমুখী বসু, যামিনী সেন প্রমুখরা চাকরি করেছিলেন বিভিন্ন জায়গায়। ঠাকুরবাড়ির মেয়ে সরলা দেবী চাকরি নিয়ে গিয়েছিলেন হায়দ্রাবাদে। (মুরশিদ, ২০১৮ : ১১৬)

তবে কৃষ্ণভাবিনী নিজেও এই বিষয়ে মনে করেন মেয়েদের পক্ষে উপার্জন সম্ভব নয়। মেয়েরা পুরুষের মতো চাকরি করবে সামান্য কয়েকটা টাকা উপার্জনের জন্য, দু'এক ঘণ্টা খাটবে এটা অসম্ভব। মোটকথা অর্থনৈতিকভাবে স্বনির্ভরশীল হলে নারীদের মধ্যে যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের ধারণা জেগে উঠবে, তা পুরুষের পক্ষে মেনে নেওয়া কঠিন ছিল। এখানে নারীর প্রতি পুরুষের মনোভাব প্রকাশিত হয়েছে। অন্যদিকে কৃষ্ণভাবিনীর মানসিকতাও নারীর নিজস্ব মানসিকতার পরিচায়ক। গোলাম মুরশিদ তাঁর প্রবন্ধে উভয়ের মনোভাবই তুলে ধরেছেন।

৩.৬. নারীদের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড

জন্মের পর আমরা নিতান্তই একটি প্রাণী হিসেবে জন্মাই। সংস্কৃতিই আমাদের একজন মানুষে পরিণত করে। এই কথার প্রেক্ষিতে নারীকে মূল্যায়ন করলে বোঝা যায় একসময় নারীর জীবন

খাঁচায় বন্দি পশুর মতোই ছিল। কারণ গৃহকর্মের বাইরে অন্যকোনো কর্মকাণ্ড নারীর ছিল না। ঠাকুরবাড়ির নারীরা প্রথম কোনো সংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করেন। তবে তা ছিল সমাজের নীতিবিরুদ্ধ। প্রথমত, সমাজের তোয়াক্কা না করা এবং দ্বিতীয়ত, পারিবারিক ঐতিহ্যের কারণে তাঁদেরকে সবাই সমীহ করতেন। ফলে এই বাধা অতিক্রম করা সহজ হয়েছিল। কিন্তু সাধারণ পরিবারের নারীদের জন্য তা সম্ভব ছিল না। তৎকালীন নারীদের বন্দিদশা তথা অন্তঃপুরে অবস্থানের প্রধান কারণ ছিল মাত্র পাঁচগজী একখানা শাড়ি। নারীদের পোশাক সম্পর্কে তখন পত্রিকায় লেখা হয়, বাঙালি নারীদের পোশাক ছিল অত্যন্ত কুৎসিত ও অশালীন। কারণ শাড়ির সঙ্গে তারা কোনো ব্লাউজ বা পেটিকোট ব্যবহার করতো না। ফলে শরীরের অবয়ব স্পষ্ট বোঝা যেতো। এই পোশাক পরে তারা অন্দরমহলের বাইরে বের হতে পারতেন না, এটাই স্বাভাবিক। নারীদের জুতা পরা, গাড়িতে চড়াও ছিল নিষিদ্ধ। তখনো পর্যন্ত কেবল নারী যৌনকর্মী এবং ব্রাহ্ম মহিলারাই জুতা পারতেন। তখন বাঙালি নারীদের জন্য একটা শালীন পোশাকের প্রয়োজন ছিল। এক্ষেত্রেও ঠাকুর পরিবারের অবদানের কথা উল্লেখ করেন গোলাম মুরশিদ। জ্ঞানদানন্দিনী দেবী ছিলেন বাঙালি নারীদের শালীন পোশাকের পথিকৃৎ।

নারীদের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের মধ্যে ছিল গান, নাটক, থিয়েটারে অংশগ্রহণ। তবে দুঃখজনক হলেও সত্য নারীদের জন্য এটা ছিল দুঃসাহসিক বিষয়। গোলাম মুরশিদ *'সুকুমারী থেকে সুচিত্রা'* প্রবন্ধে তথ্য উপাত্ত উপস্থানের মাধ্যমে অভিনয়ে নারীদের ইতিহাস তুলে ধরেছেন। উনিশ শতকের প্রথমদিকে কেউ ভাবতেই পারেননি মেয়েরা অভিনয় করতে পারবেন। বাংলা নাটকের অভিনয় আরম্ভ হয় ১৮৫০ এর দশকে। তবে এসময় নাটকে যে নারীরা অংশ নিয়েছিলেন তারা ছিলেন যৌনকর্মী, বাইজি, অথবা এই শ্রেণির মহিলা। প্রথমত, অর্থ উপার্জন এবং অপরদিকে নিজেদের আলাদা আত্মমর্যাদা বৃদ্ধির জন্য তারা এই পেশায় সংযুক্ত হয়। এসময় অনেক সমালোচক পত্রিকায় লেখেন, এঁরা 'বেশ্যা'দের মঞ্চে এনে নাটককে যাত্রার স্তরে নামিয়েছেন। নারীরা তখন দুই শ্রেণিতে বিভক্ত ছিলেন। ঘরের নারী আর বাইরের নারী। গোলাম মুরশিদ পুরুষের এই মানসিকতাকে তীক্ষ্ণ নিন্দা করে বলেন:

> পুরুষেরা আশা করতেন ঘরের নারীরা হবেন পিঞ্জরাবদ্ধ বিহঙ্গীর মতো। সতী সাদ্ধী হবেন। বন্দী থাকবেন অন্তঃপুরে। [...] শীৎকার কথাটা প্রযোজ্য ছিলো বেশ্যাদের জন্যে, ভদ্রমহিলাদের জন্য নয়। তাঁরা লাজনম্র হবেন। যৌনসুখও নারীরা উপভোগ করবেন না। তাঁরা প্রিয়া নয়, তাঁরা সন্তানের জননী। (মুরশিদ, ২০১৯ গ : ৩০৯)

নারীরা যখন মঞ্চে আসা শুরু করলো তখন তাদের যেসব বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছিল তা গোলাম মুরশিদ বর্ণনা করেছেন। শারীরিক বা যৌনহয়রানির স্বীকারও হয়েছেন অনেকেই। তবে তাঁর লেখা থেকে কানন দেবী, সুচিত্রা সেনের মতো দূরদর্শী অভিনেত্রীর অভিনয়ের প্রতি ভালোবাসার প্রমাণ পাওয়া যায়। ১৯৫০ এর দশকে সমাজে নিষেধ শিথিল হওয়ায় অভিজাত পরিবারের স্ত্রী ও সন্তানের মায়েরাও অভিনয়ে এসেছিলেন। অন্যদিকে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যেহেতু অনেকগুলো নাটক লিখেছেন তাই তাঁদের পরিবারের মেয়েরা সেসব নাটকে অভিনয় করেন।

৩.৭. শিক্ষায় নারীর অবস্থান

শিক্ষা মানুষকে আলোকিত করে। অন্তঃপুরের অন্ধকারে নারীরা আলোর পথ দেখেছিলেন শিক্ষার মাধ্যমে। কিন্তু এ পথ ছিলো কণ্টকাকীর্ণ। "শিক্ষা নারীকে উপহার দেবে অকাল বৈধব্য কিংবা শিক্ষিত নারীকে সমাজ বিচ্ছিন্নতার দায় নিয়ে কাটাতে হবে সারাজীবন – এমনসব আশঙ্কা নিয়ে নারীকে রীতিমতো যুদ্ধ করতে হয়েছে।" (ফারজানা, ২০১৮ : ১২) তবে তারা

উপলব্ধি করতে পেরেছিল উন্নতি এবং মুক্তির প্রথম শর্ত শিক্ষা, নিজেকে এবং জগৎকে জানা। ফলে আমরা দেখি পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত আধুনিক যুগের পুরুষেরা নারীর শিক্ষার দিকেই প্রথম দৃষ্টিপাত করেন। তবে এক্ষেত্রে আমাদের দুটি সন্দেহ থেকে যায়। এক, নারীদের শিক্ষার তাগিদ কোথা থেকে এসেছিল এবং দুই, কেন এসেছিল। প্রথমত, গোলাম মুরশিদ দেখিয়েছেন নব্যশিক্ষিত বাবুসমাজ পাশ্চাত্যের ধ্যান-ধারণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে এবং পাশ্চাত্য নারী আন্দোলনের উৎসাহে নিজের ঘরে নারীর শিক্ষা-সংস্কারের প্রয়োজন বোধ করেন। দ্বিতীয়ত, অশিক্ষিত স্ত্রী নিয়ে সমাজে ওঠাবসা করা তাদের জন্য সম্মানজনক ছিল না। ফলে নারীদের শিক্ষার প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে ওঠে। যে পুরুষরা শিক্ষা নারীকে তাঁর অধিকার সম্পর্কে সচেতন করে তুললে চিরকালীন শোষণে ছেদ পড়বে বলে নারী শিক্ষার বিরোধিতা করে তারাই আবার নারী শিক্ষায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিল। তৎকালে ব্যক্তিগত বা পারিবারিক আবহের বাইরে শিক্ষা গ্রহণ নারীর জন্য নিষিদ্ধ ছিল। সমাজের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল শিক্ষিত হলে নারীরা বিধবা হবে। এই কুসংস্কার নারীকে শিক্ষা থেকে বহুদূরে সরিয়ে রাখে। উচ্চবর্ণের হিন্দু, ব্রাহ্ম এবং খ্রিস্টান পরিবারের নারীরা স্বামীর আগ্রহে শিক্ষার সুযোগ পায়। পর্দা প্রথা, ধর্মীয় কুসংস্কার, বাল্যবিবাহ, নারীশিক্ষা বিকাশের অন্তরায় ছিল। নারী শিক্ষাকে প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায় বিকশিত করার ক্ষেত্রে ইংরেজদের ভূমিকায়ই ছিল মুখ্য। তবে "বঙ্গদেশে মুসলমান মহিলাদের শিক্ষাদানের প্রয়োজনীয়তা মুসলমান সমাজে মহিলারাই প্রথম উপলব্ধি করেন। উনিশ শতকের গোড়ার দিকে হিন্দুসমাজে স্ত্রীশিক্ষার ইতিহাসের তুলনায় এ ইতিহাস ছিলো সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির" (সরকার, ২০২৩ : ১৬৫)। অনেক বাধা বিপত্তি পেরিয়ে নারীরা শিক্ষিত হয়ে ওঠার পিছনে যেমন পুরুষের ভূমিকা ছিল ঠিক তেমনি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল নারীদের সদিচ্ছা। তাঁদের আগ্রহ না থাকলে নারীশিক্ষার প্রচলন সম্ভব হতো না। গোলাম মুরশিদ তাঁর *নারী প্রগতির একশো বছর* গ্রন্থে এমন দুঃসাহসিক ও দৃঢ় মনোবল সম্পন্ন নারীদের কথা তুলে ধরেছেন। শিক্ষা ও প্রগতির এই ধারায় প্রথম আত্মজীবনী রচয়িতা রাসসুন্দরী দেবী, প্রথম মহিলা গ্রন্থ রচয়িতা কৈলাসবাসিনী দেবী, প্রথম আধুনিকা জ্ঞানদানন্দিনী দেবী, প্রথম মুসলিম গদ্য লেখিকা বিবি তাহেরন নেছা এবং নারীবাদী বেগম রোকেয়া অন্যতম। শিক্ষার মাধ্যমেই নারীদের আত্মার বিকাশ ও ব্যক্তিসত্তা গড়ে ওঠে তা তিনি দেখিয়েছেন। অরু ও তরু দত্তের মতো নারীরা তখন বিদেশে গিয়েছেন পড়াশোনা করতে। যা ছিল অসম্ভব এবং অকল্পনীয়। নারীদের বিজয়গাঁথা এভাবেই সূচিত হয়েছে।

৪. উপসংহার

উনিশ শতকে যে নবচেতনার উন্মেষ ঘটে তার একটি গুরুত্বপূর্ণ অভিমুখ ছিল নারীর অবস্থানকে মানবিক দৃষ্টিতে বিচার করা, সমাজে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা করে তোলা। সমাজের কুপ্রথা ও কুসংস্কার থেকে নারীদের মুক্তির জন্য কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করা হলেও তাকে স্ত্রী স্বাধীনতা কিংবা নারীমুক্তি বলা চলে না। মেয়েদের সামাজিক অবিচার ও পীড়ন থেকে মুক্তি দিতে আন্দোলন শুরু করেছিলেন পুরুষরা এবং ইতিহাসেও বিবৃত হয় তাঁদের বয়ান। কিন্তু বিপরীতে একজন নারীর বয়ানও থাকতে পারে, সেটিই গোলাম মুরশিদ খুঁজে দেখেছেন তাঁর মানবীবিদ্যা চর্চায়। গোলাম মুরশিদের অনেক লেখায় নারী এবং নারীর ইতিহাস সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয় উঠে এসেছে। তিনি নারীদের যথার্থ মুক্তির পথ ও প্রক্রিয়া অনুসন্ধান করেছেন নির্মোহভাবে। যখন নারীবাদ শব্দটির জন্ম হয়নি তখন তিনি নারীদের ইতিহাস তুলে এনেছেন; তাঁদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির প্রয়াস করেছেন। তিনি খুব স্পষ্টভাবে খেয়াল করেছেন 'নারীবাদ' শব্দটি প্রচলিত হবার পর তথাকথিত নারীবাদীরা নারীর অধিকার ও অগ্রগতির চেয়ে পুরুষ বিদ্বেষীতাকেই তাদের মূল লক্ষ্য করে তুলেছেন। ফলে নারীবাদী তত্ত্ব

নারীকে প্রকৃত স্বাধীনতার সুখ দিতে ব্যর্থ হচ্ছে। আধুনিক যুগে এসেও নারীরা প্রকৃত অর্থে স্বাধীন হয়নি বলে তিনি মনে করেন। আধুনিক নারীবাদীদের ভালোমন্দ দিক বিশ্লেষণ করে তিনি দেখিয়েছেন নারীরা বর্তমানে নিজেদের নয় পুরুষকে নিয়ে চর্চা করতে অধিক পছন্দ করে। পুরুষ বিদ্বেষী মনোভাবই তাদের আন্দোলনের মূল কেন্দ্রবিন্দু। তিনি মনে করেন নারী নিজেকে চিনলে, নিজের ইতিহাস, কর্তব্য ও অধিকার সম্পর্কে সচেতন থাকলে যথার্থ মুক্তি সম্ভব। গোলাম মুরশিদের প্রবন্ধগুলোকে তাই 'নারীবাদী' না বলে 'মানবীবিদ্যাচর্চাকারী' বলাই শ্রেয়। বিভিন্ন প্রবন্ধে উল্লিখিত নারীদের পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয়, শিক্ষা এবং সাংস্কৃতিক অবস্থান পর্যালোচনার মাধ্যমে বলা যায় তাঁর প্রবন্ধগুলো নিঃসন্দেহে মানবীবিদ্যা চর্চার ধারাকে সমৃদ্ধ করেছে।

সহায়কপঞ্জি

আনু মুহাম্মদ (২০১২)। *নারী পুরুষ ও সমাজ*। ঢাকা: সংহতি।

আলী রীয়াজ (সম্পা., ১৯৯৫)। *বাংলাদেশের নারী*। ঢাকা, চারদিক প্রকাশন।

আহমদ শরীফ (২০১১)। *নির্বাচিত প্রবন্ধ*। ঢাকা, আগামী প্রকাশনী।

গোলাম মুরশিদ (২০০৭)। *নারী ধর্ম ইত্যাদি*। ঢাকা, মুক্তধারা।

——— (২০১৫)। *রেনেসন্স বাংলার রেনেসন্স*। ঢাকা: অবসর।

——— (২০১৮)। *নারী প্রগতির একশো বছর রাসসুন্দরী থেকে রোকেয়া*। ঢাকা, অবসর।

——— (২০১৯ ক)। *আধুনিকতার অভিঘাতে বঙ্গরমণী*। ঢাকা, প্রথমা প্রকাশন।

——— (২০১৯ খ)। *হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি*। ঢাকা, অবসর।

——— (২০১৯ গ)। *শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ*। ঢাকা, কথাপ্রকাশ।

জয়িতা দাস (২০১৭)। *পর্দাপুরাণ বাঙালি নারীর আড়াল ও অন্তরাল*। কলকাতা, কারিগর।

নিবেদিতা দাশপুরাকায়স্থ (১৯৯৯)। *মুক্তি মঞ্চে নারী*। ঢাকা, পিপস্ট্রিস্ট প্রকাশন।

ফারজানা সিদ্দিকা (২০১৮)। *নারীর সৃষ্টি: নারীর দ্বন্দ্ব*। ঢাকা, কথাপ্রকাশ।

বিলকিস রহমান (২০১৩)। *উনিশ শতকে বাংলায় নারী পুরুষ সম্পর্ক*। ঢাকা, বাংলা একাডেমি।

মালেকা বেগম (২০০২)। *বাংলার নারী আন্দোলন*। ঢাকা, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড।

মালেকা বেগম ও সৈয়দ আজিজুল হক (সম্পা., ২০০৪)। *আমি নারী: তিনশ বছরের বাঙালি নারীর ইতিহাস*। ঢাকা: দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড।

মুহম্মদ সাইফুল ইসলাম (২০০৯)। *অক্ষয়কুমার দত্ত ও উনিশ শতকের বাঙলা*। ঢাকা, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি।

সুমনা দাশ সুর (২০১৯)। "গোলাম মুরশিদ: গবেষণার অন্তর্মহলে", *সম্মাননা গ্রন্থ আশিতে মুরশিদ*। কলকাতা, দেবব্রত বিশ্বাস স্মরণ কমিটি।

স্বরোচিষ সরকার(২০২৩)। *মুসলমান লেখকদের সমাজভাবনা (১৮৬৯-১৯৪৭)*। ঢাকা, মাদার্স প্রকাশন।

স্বরোচিষ সরকার সম্পা. (২০১৯)। *গোলাম মুরশিদ সংবর্ধনা গ্রন্থ*। ঢাকা, কথাপ্রকাশ।

হুমায়ুন আজাদ অনূ. (২০১২)। *সিমোন দ্য বোভোয়ার দ্বিতীয় লিঙ্গ*। ঢাকা, আগামী প্রকাশনী।